দৈনিক আয় দেড় কোটি টাকা

দেশের বিভিন্ন নদীতে ড্রেজিংয়ের নামে বালু-সন্ত্রাসীদের বেপরোয়া তান্ডব চলছে। তারা সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর কাছ থেকে নদীর বালুমহাল ইজারা নিয়ে ড্রেজিংয়ের আড়ালে যাচ্ছেতাইভাবে বালু উত্তোলন করছে। নিয়মানুযায়ী নদীর মাঝখান থেকে বালু উত্তোলনের কথা থাকলেও তারা তা না মেনে বরং তীরবর্তী এলাকা এবং সেই সঙ্গে জোরপূর্বক পার্শ্ববর্তী চর থেকেও বালু কেটে নিয়ে যাচ্ছে। এ থেকে দৈনিক অন্তত দেড় কোটি টাকা লেনদেন হচ্ছে। এই টাকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভাগবাটোয়ারা করে নিচ্ছে সরকারদলীয় মন্ত্রী-সাংসদ-স্থানীয় নেতা এবং পুলিশ প্রশাসন। কিন্তু অর্থলোলুপ এসব বালু-দস্যুর কারণে ইতিমধ্যে দেশের বহু গ্রাম নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বিলীন হওয়ার পথে আছে আরো অনেক গ্রাম...

রিপোর্ট করেছেন **মোস্তফা সারোয়ার বিপ্লব, অপূর্ব কুমার**

শীতলক্ষ্যা পাড়ের কাজৈরচর

নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার ডাঙ্গা ইউনিয়নের কাজৈরচর। এ চরে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় দুই হাজার বিঘা। খাসজমি হলেও নদী শিকস্তি নিয়ম অনুযায়ী এই ইউনিয়নের মানুষই বসতি গড়ে তোলে। বর্তমানে ২২টি ভূমিহীন পরিবার ৩০০ বিঘা জমি লিজ নিয়ে সেখানে বসবাস করছে। এই চরে গম, ভুট্টা, আলু, বাদামসহ বিভিন্ন ধরনের কৃষিপণ্যের আবাদ হয়। কিন্তু চরের প্রতি বালু-সন্ত্রাসীদের নজর পড়ায় জনবসতি ও চাষাবাদ দুটোই এখন হুমকির সম্মুখীন। কারণ চরসংলগ্ন শীতলক্ষ্যা নদীতে ড্রেজিংয়ের নামে অবাধে বালু উত্তোলনের পাশাপাশি এখন খোদ চর থেকেও কোদাল দিয়ে বালু কেটে অবাধে বিক্রি করা হচ্ছে। বালু-সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ভয়ে এলাকার কেউ প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, টুঁ শব্দ করারও সাহস পায় না। সরেজমিন ঘুরে এবং এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে এ অভিযোগ পাওয়া গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তিন বছর ধরে শীতলক্ষ্যা নদীতে ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে এবং নদী-তীরবর্তী চর থেকেও কোদাল দিয়ে বালু কেটে নিয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাসীরা। এভাবে অবাধে বালু কাটার কারণে ইতিমধ্যে কাজৈরচর ও ইসলামপাড়ার কয়েকটি অংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

নেপথ্যে বিএনপি সাংসদ মিলন!

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, শীতলক্ষ্যা নদীপাড়ের কাজৈরচরটি নরসিংদীর পলাশ উপজেলার অধীন হলেও বালু কেটে নিচ্ছে পার্শ্ববর্তী গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার লোকজন। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় ডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, তিনি ভূমিদস্যুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন এবং বিষয়টি প্রশাসনকেও জানিয়েছেন। কিন্তু প্রশাসন এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছে। তিনি অভিযোগ করেন, এলাকাবাসীকে নিয়ে এর প্রতিবাদ করায় সন্ত্রাসীরা তার ওপর হামলা চালায়। তা সত্ত্বেও তিনি প্রতিবাদ করে যাচ্ছেন। সর্বশেষ গত ১০ আগস্ট এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কাজৈরচরে প্রতিবাদ সভা করেছেন বলে জানান। তারপরও থেমে নেই বালু কাটা। চেয়ারম্যান আরও অভিযোগ করেন, 'কালীগঞ্জের সাংসদ ফজলুল হক মিলন আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ায় তিনিই নেপথ্যে থেকে তার বাহিনী দিয়ে এই অবৈধ কাজ করাচ্ছেন।'

স্থানীয় লোকজন জানান, চর লুটের প্রতিবাদ করাও তাদের জানমালের জন্য খুবই বিপজ্জনক। কারণ প্রশাসনিক দিক দিয়ে চরটি পলাশ উপজেলার অন্তর্ভুক্ত হলেও ভৌগোলিক দিক থেকে কালীগঞ্জের খুব কাছে। তাছাড়া

যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে এই এলাকার লোকজনের অধিকাংশ কার্যক্রমও চলে কালীগঞ্জ উপজেলায়। এজন্য তারা বালু-সন্ত্রাস রুখতে পারছেন না। প্রশাসনও এগিয়ে আসছে না।

কালীগঞ্জের সাংসদ এ কে এম ফজলুল হক ২০০০কে বলেন, 'বালু উত্তোলনের সঙ্গে তার জড়িত থাকা তো দূরের কথা, কারা এসব করছে তাদেরকে চিনিও না। তাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কও নেই।' তিনি আরো বলেন, 'তবে এখন বুঝতে পারছি রাজনৈতিক কারণে আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করতে একটি চক্র উঠে পড়ে লেগেছে।'

একেএম ফজলুল হক মিলন এমপি অভিযোগ অস্বীকার করলেও সম্পৃক্ত তিনি

বড় হোতা ছাত্রদল সভাপতি

চরের অবস্থানগত অর্থাৎ ভৌগোলিক সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে কালীগঞ্জ থানা ছাত্রদলের সভাপতি মাসুদ রানা নিয়মনীতি ছাড়াই বালু কাটছেন। অভিযোগ আছে, বর্তমানে তিনি শীতলক্ষ্যা নদীতে ৫০ থেকে ৬০টি ড্রেজার দিয়ে বালু উত্তোলন করছেন। সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, অন্যান্য জেলা থেকে এখানে বালুর দাম বেশি। কারণ শীতলক্ষ্যা নদী ও কাজৈরচরের বালু চড়া দামে বিক্রি হয় বাড্ডা থানা এলাকার বেরাইদের বসুন্ধরা প্রকল্পে, যা নৌপথে পলাশের মোটামুটি কাছে। যে কারণে বালু ব্যবসায়ীদের ভিড় এখানে তুলনামূলক বেশি। তাছাড়া নারায়ণগঞ্জসহ আশপাশের উপশহরেও বালু সরবরাহ হয় এখান থেকে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বর্তমানে প্রতি ফুট বালু ৭৫ পয়সা দরে বিক্রি করা হচ্ছে। ছাত্রদল নেতা মাসুদ রানা ও তার লোকজন কালীগঞ্জ বাজারের পাশেই টোলঘর বসিয়ে অগ্রিম টাকা নিয়ে ইঞ্জিনচালিত 'ভলগেট' মালিকদের টোকেন দিচ্ছেন। আর ক্রেতারা চরে গিয়ে 'ভলগেট' ভর্তি করে বালু নিয়ে আসছে। শীতলক্ষ্যা নদী থেকে দিন-রাত ৫০ থেকে ৬০টি ড্রেজার দিয়ে বালু উত্তোলনের পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক কোদালী দিয়ে কাজৈরচরে বালু কাটা হচ্ছে। এভাবে প্রতিদিন ২৫ থেকে ৩০ লাখ ফুট বালু উত্তোলন করা হয় এবং এর দাম প্রায় ২০ লাখ টাকা বলে ধারণা করা হয়।

এমপি-ওসি-বিএনপি নেতারা জড়িত

জানা গেছে, শীতলক্ষ্যা নদী ও কাজৈরচরের বালু লুটপাটে একটি সিন্ডিকেট রয়েছে। এ বাহিনীর মূল নিয়ন্ত্রক ছাত্রদল নেতা মাসুদ। সারা দিনের কালেকশনের টাকা সন্ধ্যায় তার কাছে চলে যায়। জানা গেছে, ফজলুল হক মিলনসহ কয়েকজন এমপি ও স্থানীয় প্রভাবশালী অনেক বিএনপি নেতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রেখেই বিনা বাধায় অবৈধভাবে বালু লুট করে নিচ্ছে মাসুদ ও তার বাহিনী। এর ওপর পলাশ এবং কালীগঞ্জ থানার দুই ওসি মাসুদের কাছ থেকে আলাদাভাবে মাসে এক লাখ টাকা করে পেয়ে থাকেন বলে অভিযোগ আছে। এমপি-ওসি-বিএনপি নেতাদের সঙ্গে মাসুদের 'ভাগবাটোয়ারা'র সম্পর্ক থাকায় এলাকার লোকজন হয়রানির ভয়ে তার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে চায় না।

বালু উত্তোলনের মূল নিয়ন্ত্রক মাসুদ রানার সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি ২০০০কে বলেন, 'লিজ এনেই এখানে বালু উত্তোলন হচ্ছে।' তিনি আরো বলেন, 'বালু উত্তোলন থেকে স্থানীয় সাংসদ আর্থিক সুবিধা নিচ্ছেন- এই অভিযোগ সত্য নয়।' তিনি বলেন, 'বালু উত্তোলনের কারণে বিনা খরচে ড্রেজিংয়ের কাজটি হয়ে যাচ্ছে। এজন্য তিনি অনেক নৌযান কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ধন্যবাদ পাচ্ছেন বলে দাবি করেন।

ইউএনও-ওসির বক্তব্য

কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আতাউর রহমান মাসিক মাসোহারা পাওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি ২০০০কে বলেন, বালু উত্তোলন ওই এলাকায় এখন লুকোচুরির কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু কেউ যদি আমার কাছে অভিযোগ না নিয়ে আসে, তাহলে আমরা ব্যবস্থা নেব কীভাবে?

পলাশ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফরিদুল ইসলাম মজুমদার বালু উত্তোলনের সত্যতা স্বীকার করে ২০০০কে বলেন, 'আমি কাজৈরচরে গিয়ে ড্রেজারের মালিকদের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখতে চাইলে তারা তা দেখাতে পারেনি।' তিনি বলেন, 'এ ব্যাপারে কোনো মামলা না হলেও জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত সেখানে যাওয়ার কথা।' তবে কবে নাগাদ ভ্রাম্যমাণ আদালত যেতে পারে সে বিষয়ে তিনি অবগত নন বলে জানান।

প্রতিমন্ত্রী রেজাউলের ১০% কমিশন!

নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলায় মেঘনা, শীতলক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী নদীর অংশ থেকেও বালু উত্তোলনের মহোৎসব চলছে। অবাধে বালু উত্তোলনের ফলে উপজেলার বিজয়নগর, চরলাউদিয়া, ভাটিবন্দর, বিরিষাগাঁও, বৈদ্যেরবাজার এই পাঁচটি গ্রামের এক-চতুর্থাংশ বিলীন হয়ে গেছে। বালু কাটার বিরুদ্ধে জনসাধারণ গঠন করেছিল 'চর কাটা প্রতিরোধ সংগ্রাম কমিটি'। প্রতিবাদ-আন্দোলন করেও বালু কাটা বন্ধ করতে পারেনি তারা। এদিকে বিগত তিন বছরে বালুমহালে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংঘর্ষে নিহত হয়েছে পাঁচজন এবং আহত হয়েছে শতাধিক। বালুমহালগুলো নিয়ন্ত্রণ করছেন স্থানীয় সরকারি দলের ক্ষমতাসীন নেতা-কর্মীরা। তারা আবার স্থানীয় এমপি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক রেজাউল করিমের অত্যন্ত নিকটজন হিসেবে পরিচিত। পাশাপাশি অভিযোগ আছে, বালুমহাল থেকে ১০% কমিশন মন্ত্রীকে দেয়া হচ্ছে। সে কারণেই এতো প্রতিরোধের পরও বালু উত্তোলন বন্ধ হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক রেজাউল করিম ২০০০কে বলেন, 'তাঁর এলাকায় সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ড্রেজিং করা হচ্ছে। অবৈধ বালু উত্তোলন হচ্ছে, কথাটি ঠিক নয়।' তিনি আরো দাবি করেন, বালু উত্তোলনের সঙ্গে নিজে এবং তাঁর লোকজন কোনোভাবেই জড়িত নয়।

অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম এমপি বালু তার জন্যে কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে

প্রতিমন্ত্রী যাই বলুন না কেন তার এলাকার চিত্র যে ভিন্ন তা ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়। এ এলাকার বালুমহালগুলোর মধ্যে রয়েছে সম্ভুপুরা, বৈদ্যের বাজার, পিরোজপুর ইউনিয়নের চরকিশোরগঞ্জ, জড়িগাঁ, নয়াচর, গোবিন্দপুর, চরলাউয়াজী, গজারিয়ারচর, তেলারচর, মেঘনা, রামগঞ্জ, নুনেরটেক, রাজপ্রাসাদের চর ও নলচর এলাকা। এসব বালুমহালে দুই থেকে আড়াইশ ড্রেজারের মাধ্যমে বালু উত্তোলন হচ্ছে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টাই। প্রতি ফুট ৫০ পয়সা করে বালু ব্যবসায়ীরা বালু কিনছেন। জানা গেছে, এই এলাকায় প্রতিদিন প্রায় ৫০ লাখ ফুট বালু উত্তোলন করা হচ্ছে যার মূল্য ২৫ লাখ টাকা। অনুসন্ধানে জানা গেছে, বালু-সিন্ডিকেটের মূল নিয়ন্ত্রণে রয়েছে উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান মিলু এবং তারই ভাতিজা বারদী ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কাশেম বাবু, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সফি উদ্দিন, মেম্বার মোক্তার হোসেন মিন্টু, শম্ভুপুরার চরকিশোরগঞ্জের মোতালেব মেম্বার, হাজী মান্নান গ্রুপ ও নুরু গাজী। এদের মধ্যে হাজী মান্নান গ্রুপ আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ও বালুমহালের নিয়ন্ত্রণে ছিলো। একমাত্র বালুমহাল নিয়ন্ত্রণের জন্য হাজী মান্নান গ্রুপ বিএনপিতে যোগ দেয় বলে এলাকাবাসী জানান।

বালুমহাল-বিরোধে বিএনপি দ্বিধাবিভক্ত

অনুসন্ধানে জানা যায়, বালুমহ-লকে কেন্দ্র করে সোনারগাঁ বিএনপি এখন দুই ভাগে বিভক্ত। উপজেলা বিএনপির সভাপতি খন্দকার আবু জাফর ও সাধারণ সম্পাদক আজহারুল ইসলাম বালুর লড়াইয়ের জের ধরে ইতিমধ্যে প্রতিমন্ত্রী রেজাউল করিমের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আজহারুল ইসলাম

তো আগামী নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন চাইবেন বলে ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক বিএনপি নেতা ২০০০কে বলেন, বালুমহালে লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করে প্রতিমন্ত্রী রেজাউল করিম আগামী নির্বাচনে এই আসনে বিএনপির পরাজয় নিশ্চিত করতে যাচ্ছেন।

জানা যায়, বালুমহালগুলোর মধ্যে মেঘনা নদীর সোনারগাঁ অংশে নয়নপুর, চরকিশোরগঞ্জ ও চরহোগলায় বালু উত্তোলন শুরু হয় বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। ২০০১ সালে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর চরহোগলা ও চরকিশোরগঞ্জের বালুমহালের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে মোতালেব মেম্বার ও মান্নান গ্রুপ। ওই বছরের ডিসেম্বরে বালুমহাল নিয়ে এ দু গ্রুপ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ ব্যাপারে সোনারগাঁও থানায় তখন দুটি মামলা হয়। বালু সিন্ডিকেটের প্রধান সাবেক উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মিলুর মধ্যস্থতায় বালু তোলার সীমানা নির্ধারণের মাধ্যমে মীমাংসা করে দেয়া হয়। কিন্তু এর দুই মাস পরেই ২০০2 সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি দু'গ্রুপে আবার চরহোগলা গ্রামে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তিন ঘন্টাব্যাপী এ সংঘর্ষে নারী ও শিশুসহ ৪৫ জন আহত হয়।

২০০3 সালে সেপ্টেম্বরে চরহোগলা ও চরকিশোরগঞ্জ বালুমহালের অবৈধ বালু কাটা নিয়ে শম্ভুপুরা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ, বিএনপির আলমগীর আলম ও নুরু গাজীর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তিনজনের পক্ষেই নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ থেকে ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীরা এসে অস্ত্রের মহড়া দেয়। এ সময় সংঘর্ষ এড়াতে সোনারগাঁ ও গজারিয়া থানা পুলিশ প্রতিদিন নদীতে টহল দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখে। কিন্তু এর দুই মাস পরেই চরহোগলা ও চরকিশোরগঞ্জের বালুমহাল নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিএনপির বিবদমান দুই গ্রুপের মধ্যে স্মরণকালের ভয়াবহতম সংঘর্ষ শুরু হয়, যা টানা তিন মাস চলে। এর মধ্যে এক গ্রুপের নেতৃত্ব দেন শম্ভুপুরা ইউপি মেম্বার নাসির উদ্দিন আর অন্য গ্রুপের নেতৃত্ব দেন সাবেক ইউপি মেম্বার মোতালেব। তাকে সমর্থন করেন বারেক মাতব্বর। ২০০3 সালের ১৭ নবেম্বর সকালে চরহোগলা গ্রামে নাসির মেম্বারের লোকজনের ওপর হামলা চালায় বারেক মোতালেব গ্রুপ। ফলে দুই গ্রুপের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। এতে ১ জন নিহত ও ২৬ জন আহত হয়। এ সংঘর্ষের কারণে চরহোগলা ও চরকিশোরগঞ্জের পুরুষরা স্থানীয় ও বহিরাগত সন্ত্রাসীদের ভয়ে পালিয়ে যায়।

এসব সম্পর্কে মোতালেব ২০০০কে বলেন, 'হাইকোর্টের নির্দেশের ভিত্তিতেই বালুমহাল থেকে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে।' উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান মিশু বলেন, 'এখানে অবৈধভাবে বালুকাটা হচ্ছে না। প্রকৃত ইজারাদাররাই বালু কাটছে'। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক হারুন অর রশিদ ২০০০কে বলেন, 'বালু উত্তোলনের লাইসেন্স দিয়ে থাকে খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়। তাই আমরা এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে পারছি না।'

ফিরিঙ্গী কান্দা এভাবেই বিলীন হতে চলেছে তুরাগ গর্ভে

চোরের ওপর বাটপারি!

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ এবং মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া এলাকা থেকে উত্তোলিত বালুর প্রায় পুরোটাই 'ভলগেটের' মাধ্যমে চলে আসে রাজধানীর বারিধারা, বাড্ডা ও টঙ্গী এলাকার বিভিন্ন হাউজিং প্রকল্পে। 'চোরের ওপর বাটপারি'র মতো অবৈধভাবে নদীর বালু গন্তব্যস্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় অন্তত পাঁচটি স্পটে পুলিশকে চাঁদা দিতে হয়। জানা গেছে, গত বর্ষায় চাঁদার স্পট ছিল ১০টিরও বেশি।

যেখানে যায় নদীর বালু

জানা গেছে, উল্লিখিত দুটি উপজেলার বালুমহালে প্রতিদিন কমপক্ষে চার হাজার ভলগেটে রাজধানীর বিভিন্ন হাউজিং প্রকল্পে বালু নিয়ে যাচ্ছে। বালু নেওয়ার সময়ই পুলিশ চাঁদা তোলে। বালুভর্তি ভলগেট মুন্সিগঞ্জের কিশোরগঞ্জ টেকে এলে মুন্সিগঞ্জ সদর থানা পুলিশকে ভলগেটপ্রতি ৩০ টাকা দিতে হয়। এরপর বন্দরের কলাগাইছ্যা পুলিশ ফাঁড়িকে দিতে হয় ২৫ টাকা। ভলগেটটি কলাগাইছ্যা ছেড়ে মুক্তাপুরের কাছাকাছি এলে বন্দর থানা পুলিশ নেয় ৩০ টাকা। বন্দরের পাশেই রয়েছে নারায়ণগঞ্জ নৌট্রাফিক পুলিশ। সিমেক্স সিমেন্ট ফ্যাক্টরির সামনে প্রতি ভলগেট থেকে তারাও নেয় ২৫ টাকা। রূপসা স্বাস্থ্য হাসপাতালের সামনে রূপগঞ্জ থানা পুলিশ নেয় ৫০ টাকা। মেঘনা নদী ছাড়াও পলাশের শীতলক্ষ্যা বালুমহাল থেকেও আরো প্রায় তিন হাজার ভলগেটে রূপগঞ্জ হয়ে ঢাকায় আসছে। সবচেয়ে বেশি চাঁদাবাজি হচ্ছে রূপগঞ্জ থানা এলাকায়। মোট ছয় হাজার ভলগেট (ট্রলার) থেকে ৫০ টাকা করে চাঁদা নিচ্ছে রূপগঞ্জ থানা পুলিশ।

বালুনদীতে বেপরোয়া চাঁদাবাজি

রাজধানী ঢাকা ও রূপগঞ্জের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা বালুনদীতে বালু ব্যবসায়ীদের ওপর দিনরাত ২৪ ঘণ্টা নির্বিঘ্নে বেপরোয়া চাঁদাবাজি, ছিনতাই আর সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চলে। এ নদীতে বালুবাহী ট্রলারগুলো থেকেই প্রতিদিন আদায় হচ্ছে ৩ থেকে সাড়ে ৩ লাখ টাকা। শীতলক্ষ্যা নদী থেকে প্রতিদিন কয়েক হাজার ট্রলারে বালু নেওয়া হয়। এসব ট্রলার বালুনদীর দিকে যাবার সময় ঢাকার খিলগাঁও থানার নাসিরাবাদ ইউনিয়নের পাশে শীতলক্ষ্যা নদীতে থাকতেই পিছু নেয় চাঁদাবাজরা। প্রতিটি স্পটে ট্রলারপ্রতি তারা আদায় করে ১০০ থেকে ১৫০ টাকা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা আরো বেড়ে যায়। কেউ চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে তাদের ওপর চলে নির্যাতন। কখনো কখনো ব্যবসায়ীদের সবকিছু ছিনতাই করে রেখে দেয় সন্ত্রাসীরা। নাসিরাবাদ ইউনিয়নের বালুরপাড় গ্রাম, ফকিরখালী, ঈদেরকান্দি, বালুপাড় ইটখোলা, কায়েতপাড়া বাজারসংলগ্ন বালুনদীর এই ৫টি স্পট এবং রূপগঞ্জের চনপাড়া, ইছাখালী, নগরপাড়া, ইছাপুরা স্পটে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চাঁদাবাজি, ছিনতাই করে সন্ত্রাসীরা। এর মধ্যে কায়েতপাড়া বাজার, চনপাড়া, নগরপাড়া ও ইছাপুরাসংলগ্ন স্পট থেকে রূপগঞ্জ থানা বিএনপি নেতা কায়েতপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নুরুজ্জামানের অনুসারী থানা যুবদল সভাপতি আলাউদ্দিন ও গোলজার মেম্বারের নেতৃত্বে চাঁদা আদায় করা হয় বলে এলাকাবাসী জানায়।

নাসিরাবাদ ইউনিয়নের বালুরপাড় ইটখোলা স্পটে সন্ত্রাসী শফিক, হিরু, আনোয়ার ও বাবুর বাহিনী চাঁদা আদায় করে। এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ীরা জানান, সন্ত্রাসীরা সবচেয়ে বেশি চাঁদা তোলে বালুরপাড় ইটখোলা থেকে। তারা আরো জানান, চাঁদাবাজরা নদীতে বালুর ভলগেটের কাছাকাছি এসেই প্রথমে গুলি ছুড়ে তাদের উপস্থিতি জানান দেয়। এভাবে বালুনদীতে কতিপয় সন্ত্রাসীর হাতে কয়েক হাজার ট্রলার ব্যবসায়ী জিম্মি হয়ে আছে। অভিযোগ আছে, নাসিরাবাদ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পরোক্ষভাবে এসব বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে। তবে সন্ত্রাসী বাহিনীগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব দেয় তার শ্যালক। তারা অনেক সময় স্পিডবোটে চড়েও সশস্ত্র মহড়া দেয়, ব্যবসায়ীদের ট্রলারে হামলা চালায়। বিশেষ করে রাতের বেলায় সন্ত্রাসী বাহিনীর তান্ডব বেড়ে যায়। বিশেষ করে দূর-দূরান্তের ব্যবসায়ীরাই বেশি হয়রানির শিকার হয়। তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে অথবা অস্ত্র উঁচিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে বালু বিক্রির সব টাকা ছিনিয়ে নেয় সন্ত্রাসীরা। এলাকার দু-একজন এর প্রতিবাদ করলে তাদের ওপরও নেমে আসে নির্যাতন। তাই এলাকার লোকজন ভয়ে চুপচাপ থাকে। অনুসন্ধানে জানা যায়, এসব সন্ত্রাসী গ্রুপ সারা

দিন যে পরিমাণ চাঁদা আদায় করে তার সবটাই সন্ধ্যায় নাসিরাবাদ ইউপি চেয়ারম্যানের ডান হাত হিসেবে পরিচিত শফিকের হাতে তুলে দেয়। সবক'টি স্পটের টাকা সংগ্রহ হওয়ার পর ওই চেয়ারম্যান নিজে প্রতিদিন প্রায় ২ লাখ টাকা নেন। বাকি টাকার সিংহভাগ নেয় শফিকসহ কয়েকজন। পাতি সন্ত্রাসীদের মধ্যেও কিছু টাকা দেওয়া হয়।

বালুনদীর বালু এভাবেই ট্রলারে করে নিয়ে যাওয়া হয় বেড়াইডে

মুন্সিগঞ্জ : সবচেয়ে বড় বালুমহাল

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দেশে ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বালু উত্তোলন শুরু হয় মুন্সিগঞ্জ জেলা থেকে। বিশেষ করে এ জেলার গজারিয়া ও সদর উপজেলার মধ্যবর্তী মেঘনা নদী থেকে সারা বছরই বালু উত্তোলন করা হয়। তবে বর্ষাকালেই সব থেকে বেশি পরিমাণ বালু উত্তোলন করা হয়। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় মুন্সিগঞ্জ সদরের জালাল কমিশনার ছিলেন বালুমহ-ালগুলোর নিয়ন্ত্রক। এরপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বালুমহালকে কেন্দ্র করে জালাল কমিশনার খুন হন। তাছাড়া আওয়ামী লীগ সরকারের সময় গজারিয়ায় বালুমহালের দখল নিয়ে গজারিয়া পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিজয় বল্লভ খুন হন। বর্তমান জোট সরকারের শুরুতে বালুমহালগুলোতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক ও ইমামপুর ইউপি চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান ও থানা যুবদলের সভাপতি হুমায়ূন কবির খান। গত বছরের বর্ষা পর্যন্ত তারাই নিয়ন্ত্রণ করতো এ জেলার বালুমহলগুলো। বর্তমানে দলীয় কোন্দলের কারণে এই দুইজন বিরোধে জড়িয়ে পড়ায় এ বছর বালুমহালগুলোর নিয়ন্ত্রণ চলে যায় এলাকাভিত্তিক সরকারি দলের নেতা-কর্মীদের হাতে। সরকারের শেষ বছরে এসে তারা যে যার খুশিমত বালু উত্তোলন করছে। সরেজমিন বালুমহালগুলোতে গিয়ে দেখা যায়, দিনের বেলায় নদীর মাঝখান থেকে বালু উত্তোলন করা হলেও রাতের অন্ধকারে গ্রামকে গ্রাম কেটে নেওয়া হচ্ছে। এ নিয়ে এলাকাবাসীও বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে পড়েছে। তারা গ্রাম রক্ষার জন্য বালুমহালগুলো বন্ধের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে গ্রামবাসী বালু উত্তোলনের ড্রেজারে হামলা চালিয়ে এবং ঝাড়ু মিছিলও করেছে। কিন্তু রুখতে পারেনি বালু উত্তোলন। গজারিয়াবাসী গত ২৫ জুলাই দৌলতপুর গ্রামে ফুলদী নদীর তীর ঘেঁষে বালু উত্তোলনকালে পাঁচটি ড্রেজার ভাঙচুর করেন।

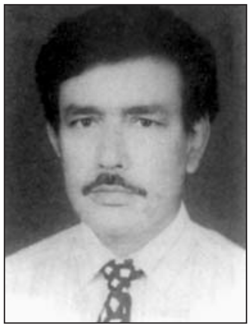

এম পি আবদুল হাই, তার নিয়ন্ত্রনে চলছে মুন্সিগঞ্জের বালু মহাল

এ ঘটনার সপ্তাহখানেক পর ভাটিবলাকী গ্রামে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের সময় স্থানীয় লোকজন হামলা চালিয়ে ১৬টি ড্রেজার ভাঙচুর করেন। তারপরও বন্ধ হয়নি বালু উত্তোলন।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার মেঘনা নদীর ৪টি বালুমহাল হচ্ছে চরবেতাগী, সিকিরগাঁও, চরবাউশিয়া এবং রায়পুরা। সেখানকার ১৬টি মৌজায় বিস্তৃত বালুমহালের আয়তন ৮২০ হেক্টর। সবগুলো বালুমহালের এবারকার ইজারা ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। তবে হাইকোর্টে রিট করে বর্তমানে সাতটি প্রতিষ্ঠান বালু কাটছে। এগুলো হচ্ছে হিমা কনস্ট্রাকশন, সামসুদ্দিন এন্টারপ্রাইজ, আজাদ কনস্ট্রাকশন, ইমন কনস্ট্রাকশন, হক ট্রেডার্স, দীনা ট্রেডার্স এবং বিপ্লব ট্রেডার্স।

বর্তমানে গজারিয়ার বালুমহ-ালগুলোর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে থানা বিএনপির দুই সহসভাপতি ইস্পাহানি মেম্বার ও দেলোয়ার হোসেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি রফিকুল ইসলাম মাসুম এবং চোরাকারবারি ও পুলিশের সোর্স খ্যাত জনৈক গিয়াসউদ্দিন। অনুসন্ধানে জানা গেছে, হিমা কনস্ট্রাকশনের মালিক হচ্ছেন বালুমহালের আগের নিয়ন্ত্রক জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক ও ইউপি চেয়ারম্যান মজিবরের ছোটভাই মিজান। তবে মিজানের নামে বালুমহালের ইজারা থাকলেও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ইস্পাহানি মেম্বার, তার ছোট ভাই আঙ্গুর ও রশিদ মেম্বার। এই সিন্ডিকেট গুয়াগাছিয়া ইউনিয়নের চরবাউশিয়া এলাকা থেকে প্রতিদিন ১০ লাখ ফুট বালু উত্তোলন করছে, যার মূল্য ৫ লাখ টাকা। সেখানে বালুর বিক্রির টাকা আদায় করছে রশিদ মেম্বারের ছেলে মুক্তার ও ইস্পাহ-ানির ছোট ভাই কবির। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, এই টাকার ১০% মুন্সিগঞ্জ-৪ আসনের সাংসদ আবদুল হাই এবং ৫% বালুমহালের ইজারাদার মিজানকে দেয়া হয়। তবে সাংসদ আবদুল হাই ২০০০কে বলেন, 'বালু উত্তোলনের খবরটি নতুন কিছু নয়। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন হয়েছে, বর্তমানে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ড্রেজিং হচ্ছে, পার্থক্য শুধু এতোটুকু। এরপর তিনি বরাবরের মতো স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলেন, 'আপনাদের তো কাজ নেই, দেশেও কোনো খবর নেই। অভিযোগ যা পেয়েছেন ছাপিয়ে দেন। বাকিটা পাবলিক বুঝবে।'

গজারিয়ার বালু সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রক গিয়াসউদ্দিন

একই এলাকার মনাইরকান্দিতে বালু উত্তোলন করছেন জনৈক মাহবুব। হোসেন্দী ইউনিয়নের চরবেতাগী এবং সিকিরগাঁও মৌজায় বালুমহালগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে দীনা ট্রেডার্স ও বিপ্লব ট্রেডার্স। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের মালিক যথাক্রমে থানা বিএনপির সহসভাপতি দেলোয়ার হোসেন ও তার ভাই বেলায়েত হোসেন। তবে এরা দু'জন বালুমহালের মালিক হলেও সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মাসুম ও চোরাকারবারি গিয়াসউদ্দিন। এখান থেকে অবৈধ বালু উত্তোলনের টাকা তোলেন থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি রিপন এবং হোসেন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন। স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মাসুম ও গিয়াসউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন বালু সিন্ডিকেট মেঘনা নদীর গজারিয়া অংশে ২০০ ড্রেজার এবং সহস্রাধিক ভলগেট দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৮০ থেকে ৯০ লাখ ফুট বালু সরবরাহ করা হয়, যার মূল্য ৪৫ লাখ টাকা। রাতের বেলায় হোসেন্দী ইউনিয়নের রঘুরচর, ইসমানিরচর, গোয়ালগাঁও, চরবলাকী, ভাটিবলাকী, ভবানীপুর গ্রামের পাশে বালু কাটার অভিযোগ রয়েছে। এর ফলে গ্রামগুলো এখন ভাঙনের মুখে রয়েছে। কিন্তু চোরাকারবারি গিয়াসউদ্দিনের সন্ত্রাসী বাহিনীর ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে পারছে না। এদিকে গিয়াসউদ্দিন এলাকায় একজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও চোরাকারবারি হিসেবে পরিচিত হলেও গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তফাজ্জল হোসেনের সঙ্গে তার 'অবৈধ লেনদেনের সম্পর্ক' আছে বলে শোনা যায়। গিয়াসউদ্দিনের সঙ্গে ওসি তফাজ্জল প্রকাশ্যেও চলাফেরা করে থাকেন। বালুমহালের চাঁদা হিসেবে এই ওসিকে প্রতি মাসে এক লাখ টাকা করে দেয় গিয়াসউদ্দিন। আগের সব ওসিদের সঙ্গেও তার এরকম সম্পর্ক ছিল। বর্তমান ওসি তফাজ্জল হোসেন ২০০০কে বলেন, 'বালুমহালে যা হচ্ছে সব কিছুই উপরের নির্দেশে।' তবে তার বিরুদ্ধে মাসোহারা নেয়ার

অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন।

জানা যায়, গিয়াস উদ্দিন মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও চাঁদপুরের নৌপথের চোরাকারবারিদের গডফাদার। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় উপজেলার আটটি ইউনিয়নের সব কটার চেয়ারম্যান এক জোট হয়ে রেজ্যুলেশনের মাধ্যমে তাকে সন্ত্রাসী এবং চোরাকারবারি হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

এসব ব্যাপারে গিয়াসউদ্দিনের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করলে তিনি ২০০০কে জানান, 'চুরি করে তা বালু কাটা হচ্ছে না, যা কিছু হচ্ছে সব প্রকাশ্যেই।' তিনি আরো বলেন, 'লিজের মাধ্যমেই বালু উত্তোলন হচ্ছে।' আর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি রফিকুল ইসলাম মাসুম বলেন, 'নিয়মতান্ত্রিকভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে।'

সাভারের বালুমহাল

সাভার উপজেলা ও কেরাণীগঞ্জের সীমান্তবর্তী ইউনিয়ন ভাকুর্তা ইউনিয়নের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া তুরাগ নদীতে বর্তমানে বেপরোয়াভাবে বালু উত্তোলন চলছে। এই ইউনিয়নের পর থেকেই কেরাণীগঞ্জ উপজেলা। ইউনিয়নটির মশিরখোলা মৌজার শ্যামলা, বাহেরচর ও বছিলা গ্রাম ইতিমধ্যে বালু উত্তোলনের কারণে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ২০০১ সালে চার দলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর ভাকুর্তা ইউনিয়নের ফিরিঙ্গিকান্দা, চুনারচর, নলাগরিয়া, ডোমারকান্দা, নন্দের খামার, বছিলা ও বাহেরচর এলাকায় অপরিকল্পিত বালু উত্তোলন শুরু হয়। সরকারি দলের শওকত, জসিম, আইন উদ্দিন, তফিজ উদ্দিন, হাজি মোঃ আনোয়ার হোসেন, সিরাজুল ইসলাম কালাম গড়ে তোলে 'বালু বাহিনী'। এই বাহিনী ঢাকা-সাভার সড়কে আমিনবাজারের পার্শ্ববর্তী প্রস্তাবিত মধুমতি মডেল টাউন এবং সাভার স্মৃতিসৌধের কাছে দেওয়ান রিয়েল এস্টেটের নিচু জায়গা ভরাটের দায়িত্ব পায়। তারা মশিরখোলা মৌজা থেকে বালু উত্তোলন করে ট্রলারের মাধ্যমে তা মধুমতি মডেল টাউনে পৌঁছে দেয়। প্রতিদিন এ কাজে ৩০ থেকে ৩৫টি ট্রলার ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া পাইপলাইনের মাধ্যমেও বালু উত্তোলন করে মধুমতি মডেল টাউন ভরাট করা হয়। এই চক্র প্রতিদিন ১৫ লাখ টাকার বালু উত্তোলন করে ট্রলারের মাধ্যমে মধুমতি মডেল টাউন ও দেওয়ান রিয়েল এস্টেটসহ বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেয়।

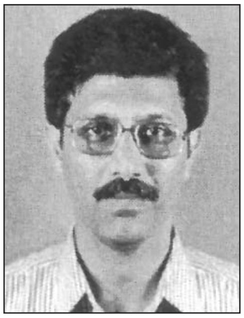

ডা. দেওয়ান সালাউদ্দিন এমপি সাভার বালু মহাল তার ইমেজ ধ্বসের অন্যতম কারণ

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, ভাকুর্তা ইউনিয়নের শ্যামলা, বাহেরচর, বছিলা গ্রাম ইতিমধ্যে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এখন ফিরিঙ্গিকান্দি, চুনারচর, নলগরিয়া, ডোমরাকান্দা ও নন্দের খামার গ্রাম বিলীন হবার পথে। ভাকুর্তার স্থানীয় স্কুলশিক্ষক আনোয়ার আলী সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'সরকারি দলের ক্যাডাররা মধুমতি মডেল টাউন ভরাট করার জন্য কোটি কোটি টাকার বালু উত্তোলন করে বিক্রি করছে। এতে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে তিনটি গ্রাম। আরো ৪টি গ্রাম বিলীন হবার পথে। স্থানীয় সাংসদ এর সঙ্গে জড়িত থাকায় প্রতিকার চেয়ে কোনো লাভ নেই।' স্থানীয় এনজিও কর্মী শিমলা পারভিন বলেন, 'বালু সন্ত্রাসের সঙ্গে বিএনপির নেতা-কর্মীরা জড়িত। স্থানীয় সাংসদ এদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। ভাকুর্তার জনগণের পক্ষে কথা বলায় ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলামকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাই ভয়ে আর কেউ কথা বলে না।' তবে ভাকুর্তা ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান হাজি আনোয়ার হোসেন ২০০০কে বলেন, 'আমি বালু উত্তোলনের সঙ্গে জড়িত নই। বাহেরচর ও বছিলা নদী ভাঙনের কারণে বিলীন হয়ে গেছে। এর সঙ্গে স্থানীয় সাংসদ জড়িত নন।'

এলাকাবাসীর অভিযোগ, বালু সন্ত্রাসীদের কারণে তিনটি গ্রাম বিলীন হওয়ার পর আরো ৪টি গ্রাম বিলীন হবার পথে থাকলেও স্থানীয় সাংসদ প্রতিকারের জন্য এগিয়ে আসেননি। বালু সন্ত্রাসী সিন্ডিকেটের কাছ থেকে প্রতি মাসে ৩০ লাখ টাকা কমিশন নিয়ে থাকেন। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করলে স্থানীয় সাংসদ ডাঃ দেওয়ান সালাহউদ্দিন বাবু ২০০০কে বলেন, 'বালু সন্ত্রাসের সঙ্গে আমি বা আমার লোকজন জড়িত নয়। এটা আমার বিরুদ্ধে বিরোধী দলের স্রেফ অপপ্রচার।' এদিকে সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায়, তুরাগ নদীর ভাকুর্তা ইউনিয়ন অংশের বালুমহালের সর্বত্রই বালু সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র ক্যাডাররা পাহারা দিচ্ছে। অথচ প্রশাসন নির্বিকার। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে সাভার থানার ওসি আক্তারুজ্জামান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এ ধরনের কোনো অভিযোগ আমরা পাইনি। বিষয়টি তদন্ত করে দোষীদের ধরার চেষ্টা করবো।'

স্থানীয় সাংসদ, প্রশাসন নির্বিকার থাকলেও ঘুম নেই নদী ভাঙ্গনের আতংকে থাকার চারটি গ্রামের জনগণ। বালু-সন্ত্রাসীদের অপরিকল্পিত ও অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের কারণে কখন যে বছিলার মতো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় তাদের বহু বছরের বাস্তুভিটা।

আগ্রাসী বালু উত্তোলন দৈনিক আয় প্রায় দেড় কোটি

কালীগঞ্জ কাজৈর চর	২০ লাখ
সোনারগাঁ	২৫ লাখ
গুয়াগাছিয়া	৫ লাখ
হোসেন্দী	৪৫ লাখ
সাভার	১৫ লাখ
মুক্তারঘাট	২ লাখ ১০ হাজার
তালাইমারী	২৭ হাজার ৫০০
শ্যামপুরঘাট	২৪ হাজার ৭৫০

প থে প থে চাঁ দা বা জি

মুন্সিগঞ্জ সদর থানা পুলিশ	৯০ হাজার
কলাগাইছ্যা পুলিশ ফাঁড়ি	৭৫ হাজার
বন্দর থানা পুলিশ	৯০ হাজার
নারায়ণগঞ্জ নৌ ট্রাফিক পুলিশ	৭৫ হাজার
রূপগঞ্জ থানা পুলিশ	৩ লাখ
বালু নদী (বিএনপি)	৩ লাখ ৫০ হাজার
নাছিরাবাদ (চেয়ারম্যান গ্রুপ)	১২ লাখ
মোট	১ কোটি ৪৪ লাখ ২২ হাজার

রাজশাহীর বালুরঘাট

প্রমত্তা পদ্মা নদীর তীরবর্তী রাজশাহী শহরে দীর্ঘদিন ধরেই বালুর রমরমা ব্যবসা চলছে। নামমাত্র মূল্যে বালুমহাল ইজারা নিয়ে একটি ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট মাসে প্রায় কোটি টাকার ব্যবসা করে। তাদের এই অবৈধ ব্যবসার কারণে একদিকে সরকার রাজস্ব হারায়, অন্যদিকে খোদ রাজশাহী শহরসহ বিভিন্ন গ্রামগঞ্জ ভাঙনের মুখে পড়ে গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, রাজশাহীসহ আশপাশের জেলাগুলোতে শত কোটি টাকার বালুর যোগান দেয় মূলত রাজশাহীর তিনটি বালুর ঘাট। অথচ বালুর ঘাট তিনটিকে প্রত্যেক বছর ইজারা দেওয়া হয় নামমাত্র মূল্যে। সরকারদলীয় নেতা-কর্মীরা এই বালু বিক্রির টাকার ভাগবাটোয়ারা মহোৎসবে মেতে থাকে সারা বছর। বৃহৎ এ সিন্ডিকেটের দাপটে অন্য কেউ বৈধভাবেও বালুর ব্যবসা করতে পারে না বলে সাধারণ বালু ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেন।

মুক্তারপুর বালুর ঘাট

রাজশাহীর সীমান্তবর্তী চারঘাট থানায় মুক্তারপুর গ্রামের বালুমহাল এই অঞ্চলে সব থেকে বড় স্পট। এটি সারদা ক্যাডেট কলেজের অদূরে অবস্থিত। তুহিন নামের একজন মুদি দোকানী জানান, ছোটবেলা থেকেই সে এ বালুমহাল দেখে আসছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রত্যেক বছর প্রভাবশালী বালুর ব্যবসায়িরা তহসিল অফিস থেকে নামমাত্র মূল্যে ইজারার নাম করে এটি দখল করে রাখে। বালুর ব্যবসায় সরকারি ও বিরোধী উভয়দল মিলেই ভাগবাটোয়ারা করে নেয় বালু বিক্রির টাকা। তবে সরকারি দলের নেতা-কর্মীরাই বেশি সুবিধা পেয়ে থাকে বলে স্থানীয় লোকজন মনে করেন। তজিমুল নামের একজন ব্যবসায়ী জানান, 'মুক্তারপুর ঘাটের ইজারা পুরোপুরি বৈধ। তহসিল অফিস থেকে প্রত্যেক বছর এই ইজারা নেয়া হয়।' তবে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বালু ব্যবসায়ী সাইদুর রহমানের সঙ্গে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা

করলেও তিনি প্রতিবারই সেল ফোনটি কেটে দেন।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে , বর্তমানে এই বালুর ঘাটের ব্যবসার সাথে প্রায় ২০০ ছোট-বড় ব্যবসায়ী জড়িত। তহসিল অফিসের ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয় থেকে এই বালুমহালের ইজারা নেওয়া আছে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ও রাজপাড়া থানা বিএনপির নেতা সাইদুর রহমান এবং দরগাপাড়ার ঠিকাদার মেরাজ আলীর নামে। রশীদ নামের একজন বালু ব্যবসায়ী জানায়, এ দুজনই ঢাকা থেকে কিছু কাগজপত্র নিয়ে এসে দাবি করে যে তারা ঘাট ইজারা নিয়েছে। বালু ব্যবসায়ী মফিজউদ্দিন ২০০০কে জানান, বৈশাখ–চৈত্র মেয়াদে একবছরের জন্য তহসিল অফিসের প্রধান কার্যালয় থেকে সাড়ে ছয় লাখ টাকা দিয়ে ইজারা নেয়া হয়। আবার চারঘাট পৌরসভা একই ঘাট ইজারা দেয় মাত্র ৬০ হাজার টাকায় ।

ট্রলার থেকে বালু নিয়ে যাচ্ছে শ্রমিকরা

আরেক ব্যবসায়ী নাম প্রকাশ না করার শর্তে ২০০০কে বলেন, ইজারা নেয়ার মধ্যেও ঘাপলা রয়েছে। কতিপয় বালু ব্যবসায়ী এই ঘাট বৈধ ইজারার কথা বললেও মূলত প্রশাসনের সঙ্গে আঁতাত করে তারা নকল কাগজপত্র তৈরি করে থাকে।

সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে , মুক্তারপুর বালুমহালে বর্তমানে প্রায় ৫০টি ড্রেজারে বালু উত্তোলন করা হয়। পদ্মার এই বালুমহালে প্রতিদিন কমপক্ষে ৩ শতাধিক ট্রাকে বালু লোড হয়। এদিকে নিয়ম না মেনে পদ্মার তীর থেকে যাচ্ছেতাইভাবে বিপুল পরিমাণ বালু উত্তোলনের কারণে রাজশাহী শহর রক্ষা বাঁধসহ বিস্তীর্ণ এলাকা পদ্মায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তা দেখে জনগণ আতংকিত হলেও প্রশাসন অজানা কোনো কারণে নীরব রয়েছে।

স্থানীয় প্রশাসন ড্রেজার বসানোর জন্য তীর থেকে কমপক্ষে ৫০ গজ দূরত্ব বজায় রাখার কথা বললেও বালু সন্ত্রাসীরা তা মানছে না। এলাকা ঘুরে দেখা যায়, বেশির ভাগ ড্রেজারই নদীর তীরবর্তী রাজশাহী শহর রক্ষা বাঁধ থেকে মাত্র ১০ গজ দূরেই বালু উত্তোলন করছে।

বালু ব্যবসায়ীরা জানায়, এ বালুমহাল থেকে প্রতিদিন প্রায় ৩ শতাধিক ট্রাক বালু উত্তোলন হয়। মুক্তারপুরের বালু মোটা হওয়ায় গোটা উত্তরাঞ্চলে এই বালুর চাহিদা রয়েছে বলে জানালেন আনসার আলী নামে একজন বালু ব্যবসায়ী। তিনি আরো জানান, এই বালু নাটোর ও বগুড়াসহ বেশকটি জেলায় বিক্রি হয়ে থাকে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এখানে সাধারণত প্রতি ডবল ট্রাক বালু বিক্রি হয় ৭০০ টাকায়। এ হিসেবে দৈনিক ৩শ' ট্রাক বালুর দাম পড়ে ২ লাখ ১০ হাজার টাকা। প্রতিমাসে এ বালুর ঘাট থেকে ৬৩ লাখ টাকার বালু উত্তোলন হয়ে থাকে। তবে একজন ব্যবসায়ী বলেন, বালু বিক্রির টাকা বহু জনের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে থাকে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ২৫% সরকার দলীয় নেতা-কর্মীদের জন্য বরাদ্দ থাকে। বাকি টাকাগুলো অন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। জানা গেছে, মুক্তারপুর বালুমহালে ট্রাক প্রতি টোল আদায় করা হয় ৮০ টাকা। এছাড়া এক ট্রাক বালুর জন্য ইজারা খাতে ১৬০ টাকা করে কাটা হয়। এই বালুর ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য 'বালু ব্যবসায়ী সমিতি' নামে একটি সংগঠনও গড়ে তোলা হয়েছে। এ সমিতির প্রভাবশালী সদস্যরা হচ্ছে- আনসার আলী, আকছেদ আলী, কুরবান আলী, নজরুল ইসলাম, দুদু মেম্বার প্রমুখ। চারঘাট থানা বিএনপি, ছাত্রদল ও যুবদলের নেতা-কর্মীরা এই ঘাট থেকে বেশি সুবিধা নেয়। চারঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান জাকিরুল ইসলাম বিকুল ২০০০কে জানান, 'পৌরসভা থেকে এই বালুমহালের ৬০ হাজার টাকা ডাক দেয়া হয়েছে। পৌরসভার ভেতরে থাকায় এই চাঁদা নির্ধারণ করা হয়।'

রিকশাচালক থেকে গাড়ির মালিক

সরেজমিন গিয়ে জানা যায়, অবৈধ বালুর ব্যবসায় নেমে হানিফ আলী নামের এক রিকশাচালক মাত্র তিন বছরের মধ্যেই এখন ১৪ লাখ টাকা দামের গাড়ি হাঁকিয়ে চলে। রিকশাচালক থেকে বালুর ঠিকাদার হওয়া হানিফ আলীর অবস্থা থেকেই বোঝা যায় এ অবৈধ ব্যবসায় কি রকম অর্থ উপার্জন করা সম্ভব।

তালাইমারী বালুর ঘাট

তালাইমারী বালুর ঘাটটি রাজশাহীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম। রাজশাহী সিটি করপোরেশন ও তহসিল অফিস এই ঘাট সাড়ে বছরে ৭ লাখ টাকায় ইজারা দিয়েছে। তবে এ বালুর ঘাটটি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে। সিটি কর্পোরেশন এই ঘাটের ইজারার মূল্য নির্ধারণ করে দেয় ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা। জুন থেকে মে মেয়াদে এই ঘাটের এবারকার ইজারা নিয়েছে বুলবুল, হানিফ ও পিন্টুসহ কয়েকজন প্রভাবশালী ঠিকাদার।

অন্যদিকে তহসিল অফিসও এই ঘাট ২ লাখ টাকায় ইজারা দিয়েছে। ইজারাদার হানিফ আলী দাবি করেন, 'পুরো ইজারার প্রক্রিয়া বৈধ। কারণ সিটি কর্পোরেশন খোলা টেন্ডার আহবান করে ইজারা দিয়ে দিয়ে থাকে।' তবে বালু ব্যবসায়ী ইদুল ২০০০ কে জানান, 'এই ইজারার মধ্যে বিভিন্ন অনিয়ম রয়েছে। কারণ সিটি কর্পোরেশন নিজেদের ঠিকাদারকে অনেক সময় সুবিধা দিয়ে থাকে। তারা উন্মুক্ত টেন্ডার আহবান করার কথা বললেও আসলে তা অতি গোপনে সম্পন্ন করা হয়। বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে এই টেন্ডার প্রক্রিয়া চলে।'

সরজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে, তালাইমারি ঘাটে বর্তমানে ৫টি ড্রেজার রয়েছে। তালাইমারী ঘাট থেকে প্রায় ৫০ ট্রাক বালু রাজশাহীসহ বিভিন্ন স্থানে যায়। এখানকার প্রতি ট্রাক বালুর মূল্য ৫৫০ টাকা। এই ঘাটে দৈনিক ২৭ হাজার ৫শ' টাকার বালু লেনদেন হয়। প্রতিমাসে ব্যবসা হয় ৮ লাখ ২৫ হাজার টাকার।

শ্যামপুর ঘাট

রাজশাহীর মতিহার থানার শেষপ্রান্তে পদ্মার তীরবর্তী শ্যামপুর গ্রামে রয়েছে আরেকটি বালুর ঘাট। এক সময়ের ঐতিহ্যবাহী এ বালুর ঘাট বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ করে স্থানীয় শিবির ক্যাডার মন্টু। প্রতিদিন ৪০ থেকে ৪৫ ট্রাক বালু লোড হয় এই ঘাট থেকে। এ ঘাটের একজন বালু ব্যবসায়ী জানান, শিবির ক্যাডার মন্টুর নাম করে জামায়াতপন্থী পৌর প্রশাসক মাজেদুর রহমান এই ঘাট নিয়ন্ত্রণ করে। এ ঘাটে বালুর ব্যবসা করে নজরুল, বাবলু, তজিবর, মেরাজ, আমিনুল, সাত্তার, হান্নান প্রমুখ। এই ঘাটে প্রত্যেক ট্রাক বালুর জন্য মন্টুকে ২৫ টাকা করে দিতে হয়। প্রতি ট্রাক ৫৫০ টাকা করে এই ঘাটে দৈনিক মোট ২৪ হাজার ৭৫০ টাকার বালু কেনাবেচা হয়। ঘাট দখল প্রসঙ্গে শিবির ক্যাডার মন্টু ২০০০ কে জানান, কাটাখালি পৌরসভা থেকে তিনি ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা দিয়ে বৈধ প্রক্রিয়ায় ইজারা নিয়েছেন।

শেষ কথা

সরকার দলীয় মন্ত্রী-সাংসদ-স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও থানার ওসিদের যেখানে বালু উত্তোলনে অবৈধ কর্মকান্ড হয় কিনা তা দেখার কথা সেখানে তারাই যদি জড়িত হন তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত ও নদী ভাঙনের মুখে থাকা মানুষ কার কাছে প্রতিকার চাইবে? নদীতে ড্রেজিং কার্যক্রম চলতেই পারে। কিন্তু তা ঠিকমত হচ্ছে কিনা সেটি তদারকি করা তো সরকারেরই দায়িত্ব? সরকার তা পালন করতে পারলে অনেকগুলো গ্রাম বিলীন হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ বাস্তুভিটা ও আবাদি জমি হারানোর আশঙ্কা থেকে রেহাই পাবে, তা বলাই যায়। কিন্তু সরকার কি বালু-সন্ত্রাসীদের রুখবে বা রুখতে পারবে?